**“কৃষক, কৃষিবিদ ও এঁদের সহযোগিদের সম্মিলিত প্রয়াশেই আজকের স্বয়ম্ভর বাংলাদেশ”...।**

স্বাধীনতা অর্জনের সাড়ে চার দশক পরে দেশ আজ বহু ক্ষেত্রে বহুদুর এগিয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, বিদ্যুৎ,রাস্তা-ঘাট,ভৌত অবকাঠামো, তথ্য প্রযুক্তিসহ অনেক ক্ষেত্রে দেশের প্রভূত উন্নতি হয়েছে; মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বেড়েছে আর্থিক সক্ষমতাও; ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে কৃষির সকল সেক্টরে; আর এই উন্নতির অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছে এদেশের সাধারণ কৃষক এবং এই সাধারণ কৃষককে নিত্য নতুন লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করেছেন, কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ও তাদের সহযোগিরা ।  
কৃষির এ উন্নতি অভাবনীয়!!!

ফলে খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভরের দেশে পরিণত হয়েছে।  
জাতীয় পরিমণ্ডল থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বকীয়তায় স্থান করে নিয়েছে বাংলার কৃষি।

দেশ স্বাধীনের অব্যবহিত পরে এ দেশে আবাদযোগ্য জমি ছিল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ হেক্টর এবং মোট খাদ্য উৎপাদন ছিল ৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে সেই আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৮৫ লক্ষ হেক্টর অথচ দেশে এখন খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে ৩ গুণেরও বেশি; ভুট্টাসহ এর পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন। ১৯৭১ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি আর বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটিতে। আবার প্রতি বছর দেশে সংযোগ হচ্ছে ২৪ লক্ষ নতুন মুখ। তা সত্বেও আমাদের কৃষি কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়েনি; মাথা উচুঁ করে সগৌরবে চলমান রয়েছে।

কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়!! জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি কমতে থাকার সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অনন্য উদাহরণ। ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই ‍দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলার কৃষি।

★★দুই যুগ আগেও দেশের অর্ধেক এলাকায় একটি ও বাদবাকি এলাকায় দুটি ফসল হতো। বর্তমানে দেশে বছরে গড়ে দুটি ফসল হচ্ছে। স্বাধীনতার পর দেশে প্রতি হেক্টর জমিতে ২.০ টন চাল উৎপাদিত হতো। এখন হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হচ্ছে ৪.০ টনেরও বেশি। ধান উৎপাদন ধরে হিসাব করলে তা হয় ৬.০ টন। আর এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি ধান উৎপাদনের দিক থেকেও অধিকাংশ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ।

★★আমন, আউশ ও বোরো ধানের বাম্পার ফলনে বছরে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বে গড় উৎপাদনশীলতা প্রায় ৩ টন, আর বাংলাদেশে তা ৪.১৫ টন।

★★হেক্টরপ্রতি ভুট্টা উৎপাদনে বৈশ্বিক গড় ৫.১২ টন সেখানে বাংলাদেশে এ হার ৬.৯৮ টন।

★★বাংলার কৃষকরা এখানেই থেমে থাকেননি। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অন্যতম উদাহরণ। জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় বাংলাদেশের সাফল্যকে বিশ্বের জন্য উদাহরণ হিসেবে প্রচার করছে।

★★দেশে গত এক যুগে রীতিমতো সবজি বিপ্লব ঘটে গেছে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। একসময় দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোরেই কেবল সবজির চাষ হতো। এখন দেশের প্রায় সব এলাকায় সারা বছরই সবজির চাষ হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৬০ ধরনের ২০০টি জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। এসব সবজির ৯০ শতাংশ বীজই দেশে উৎপাদিত হচ্ছে।

★★ফুল চাষের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনায় রয়েছে বাংলাদেশের কৃষি। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে ফুলের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পরপর সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিন মহান একুশে, সে সময় শহর এলাকায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর প্রবনতা লক্ষ্যনীয় ছিল। এরপর স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মানুষের জীবনযাত্রা মানোন্নয়নের সাথে রূচিবোধের বিকাশ সাধনের পাশাপাশি ফুলের ব্যবহারও বাড়তে থাকে।   
বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ফুলচাষের শুভসূচনা হয় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা থেকে। সে আরেক ইতিহাস।  
১৯৮৩ সালে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার পানিসারা গ্রামের শের আলী সরদার ৩০ শতক জমিতে রজনীগন্ধা ফুল চাষের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ফুল চাষের গোড়াপত্তণ করেন। সুতরাং শের আলী সরদারকে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ফুল চাষের জনক বলা হয় । বর্তমানে যশোর জেলার ৫ টি উপজেলার ৭৫ টি গ্রামের ৪৫০০ জন কৃষক রজনীগন্ধা, গোলাপ, গাঁদা, গ্লাডিওলাস, লিলিয়াম, রডস্টিক, জারবেরা বিভিন্ন জাতের ফুলের চাষ হচ্ছে। সারা দেশের মোট ফুল চাহিদার ৭০% পূরণ হচ্ছে যশোর এলাকার উৎপাদিত ফুল হতে। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৩৭টি জেলায় কমবেশি ১৮ ধরনের বেশি ফুল উৎপাদন হয়। এর মধ্যে ১৯টি জেলায় বানিজ্যিকভাবে ফুল চাষ হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০০৯-২০১০ সনে ৩৭টি জেলায় মোট ৯৩১.১ হেক্টর (২৪০০ একর) জমিতে ফুল চাষ হয়। তা থেকে মোট ৮২.৭৪ কোটি (সংখ্যা) ফুল উৎপন্ন হয় ,যার মধ্যে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ফুল উৎপাদন হয়।  
২০ টির অধিক দেশে আমাদের ফুল রপ্তানি হচ্ছে, যেমন: ভারত, পাকিস্তান, ইতালি, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সিঙ্গাপুর, কাতার, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, সুইডেন, ভিয়েতনাম, জার্মানি, ডেনমার্ক, গ্রিস ও মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে ফুল রফতানি শুরু হয়েছে। এসব দেশে রজনীগন্ধা, গোলাপ, অর্কিডসহ বাহারি পাতাও রফতানি হয়। ভালো মানের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী ফুলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ফুল রপ্তানীর তথ্যচিত্র কতকটা এমন :

\*\*২০০৮-০৯ অর্থবছরে ফুল রফতানি হয় ২৮০ কোটি টাকা;

\*\*২০০৯-১০ অর্থবছরে হয় ৩১০ কোটি টাকা;

\*\*২০১০-১১ অর্থবছরে হয় ৩৩৫ কোটি টাকা এবং

\*\*২০১১-১২ অর্থবছরে ৪২৫ কোটি টাকার ফুল রফতানি হয়।

\*\*২০১২-১৩ অর্থবছরে ফুল রফতানি ৪৭০ কোটি টাকার অধিক।

★★ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । ১৯৭০ সাল থেকে দেশি জাতকে উন্নত করে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত উদ্ভাবনের পথে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটউট(বারি), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা),বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই),বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) হতে অসংখ্য লাগসই ও টেকসই ফসলের জাত উদ্ভাবিকত হয়েছে এবং সেসব নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশের কৃষি এখন অনেক অনেক উপরে অবস্থান করছে।

★★বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম।

★★ ৮৫ লাখ টন আলু উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। স্বীকৃতিটি দিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। আলু উৎপাদন সাফল্যের এ এক অপার বিস্ময়। এক দশক আগেও আলুর উৎপাদন ছিল অর্ধলাখ টনের নিচে। এখন তা এগোচ্ছে কোটি টনের দিকে।

★★সাড়ে ১০ লাখ টন আম উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্বে ৯ম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ল্যাংড়া ও আম্রপলি আম এখন বিলেত যাচ্ছে। বাংলাদেশের আমের ক্রেতা বিশ্বের সবচেয়ে বড় খুচরা পণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট। বিগত ২০১৫ মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে ৭৮৭ মেট্রিক টন আম রপ্তানি হয়েছিল। এর মধ্যে ৫২০ মেট্রিক টন আম গিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে।

★★ বিগত ২০১৫ সালে শ্রীলংকায় প্রথমবারের মতো দু’দফায় ২৫ মেট্রিক টন সরু চাল রফতানি করেছে বাংলাদেশ!

★★একসময় 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কথাটি বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বাস্তব। মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ২০১৬ বছরের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীন প্রথম এবং এর পরই রয়েছে ভারত ও মিয়ানমার। মাছ রফতানি বেড়েছে ১৩৫ গুণ। এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্টরা আরো বলছেন, বাংলাদেশে প্রতিবেশ ব্যবস্থা মিঠাপানির মাছ চাষের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এখানকার আড়াই লাখ হেক্টর উন্মুক্ত জলাশয় আর গ্রামীণ উদ্যোগে গড়ে ওঠা লাখ লাখ পুকুরে মাছ চাষের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো গেলে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ মাছ উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হতে পারে।

★★কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং দরিদ্রতা নিরসনে প্রাণিসম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ প্রাণিসম্পদ খাতকে আজ কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করেছে। দেশের বেকার জনগোষ্ঠী এবং নারীরা প্রাণিসম্পদ পালনে সম্পৃক্ত হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। দেশের বহু পরিবার আজ কেবল দুটি উন্নত জাতের গাভী অথবা স্বল্প পরিসরে ব্রয়লার/লেয়ার মুরগি পালন করে স্বাবলম্বিতার মুখ দেখেছে। এ ছাড়াও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্থিরমূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৭৩% ও প্রবৃদ্ধির হার ৩.১০%। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.০৯%. তা ছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৩১৭.৮৬ কোটি টাকা । দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০% সরাসরি ও ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনাতাত্তোর বাংলাদেশে ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে কৃষি সেক্টরে আর কৃষির সবচে বেশী উন্নতি সাধিত হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন শাসনামলে সেজন্যে আওয়ামী লীগ সরকার স্বীকৃতি পেয়েছে কৃষি বান্ধব সরকার হিসেবে। কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে গেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু !  
বর্তমান সরকারের শাসনামলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে যুগান্তকারী রিভিজিট বাস্তবায়নের ফলে এই প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির সুযোগ সহ ক্যাডার ও নন ক্যাডারে কয়েক হাজার নতুন পদ সৃজিত হয়েছে! উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কৃষি অফিসারদের জন্যে চার চাকার এসি গাড়ির প্রবর্তন করা হয়েছে কৃষি বান্ধব এই সরকারের শাসনামলেই।

১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার নামমাত্র মূল্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা খামারবাড়ির পাশে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশনকে এক একর আয়তনের জমি বরাদ্দ দেন। এবার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে এখানে ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১২ সালের মার্চে শেখ হাসিনা এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সরকারী পয়সায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটা উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শতাধিক কোটি টাকা মূল্যের এই নান্দনিক ভবণ নির্মানের নজির বাংলাদেশে বোধহয় এটাই প্রথম। সুতরাং এ ঘটনায় বোঝা যায় কৃষি ও কৃষিবিদদের প্রতি বর্তমাণ সরকারের অভাবনীয় অবদান।

এতকিছুর পরেও এখনো কৃষি সেক্টরে কর্মরত কৃষিবিদ ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের অনেক ন্যয্য দাবী অপূরণীয় রয়েছে; বাকি রয়েছে কৃষি সেক্টরে উল্মফনের অনেক কিছু।  
পদোন্নতির পথ এখনো সুগম নয়; ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের ২য় শ্রেণীতে উন্নীতকরণের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তিন বছরের অধিক হলেও বাস্তবায়িত হয়নি; আন্ত:ক্যাডার বৈষম্যের গ্যাড়াকলে পড়ে সকল যোগ্যতা থাকার পরেও পদোন্নতির পথ সুষমায়ন এবং কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। অনেক দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তার মেধা ও মননশীলতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হচ্ছেনা। পদায়নের সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা দক্ষতার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না । যেহেতু কৃষি সেক্টরটি highly technical তাই ফিট লিস্ট তৈরি করে যোগ্য ব্যক্তিদের উপযুক্ত পদে নিয়োগের আবশ্যকতা রয়েছে।  
এসব সমস্যার আশু সমাধান আবশ্যক।

অধিকন্তু যুগ সন্ধিক্ষণের পথ পরিক্রমায় দাঁড়িয়ে বিশ্বায়ন ও বিশেষায়নের কথা মাথায় রেখে আমাদের কৃষিকে নিয়ে নতুন কর্মকৌশল তৈরি করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতের কৃষিকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে এবং কৃষি ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা আবশ্যক বলে একজন কৃষিবিদ হিসেবে দীর্ঘ চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।   
এসব কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত কৃষি বিশেষজ্ঞদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লালফিতার দৌরাত্ম যেন কোনভাবেই কৃষি উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করতে না পারে সে বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।অনেক বিষয়ে সরকারী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে প্রকৃত কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়।

(১) “বদলে যাচ্ছে জলবায়ু ক্ষতি হচ্ছে কৃষির, খাপ খাওয়াতে লড়তে হবে লড়াই দিবা নিশির”.........এই আপ্তবাক্য কে সামনে রেখে পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি উৎপাদনের কৌশল অব্যাহত রাখতে হবে;

(২) আধুনিক কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে নানান ধরনের রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, বিভিন্ন ধরনের হরমোন যা প্রকারন্তরে জনস্বাস্থ্যের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ অবস্থা মোকাবেলার জন্যে জৈব কৃষির উপরে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বালাইনাশক ব্যবহার রোধে কার্যকরী আইন করত: সেটার আশু বাস্তবায়ন আবশ্যক।

(৩) কৃষি জমিতে অন্য কোন স্থাপনা তৈরির জন্যে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে।

(৪) বসত বাড়ির জন্যে বহুতল ভবন নির্মানের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে বহুতলা ভবন নির্মাণের জন্যে সহজ শর্তে সরকারীভাবে ঋণ প্রদান করতে হবে।

(৫) শহরে বসবাস ইচ্ছুক সকল নাগরিককে চীনের আদলে সরকারী ভাবে বহুতল ভবন নির্মাণ করে ফ্লাট বরাদ্দ দিয়ে কিস্তিতে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাহলে কৃষি জমির উপরে চাপ কমবে।

(৬) হাজা মজা পুকুর ডোবা যেখানে মাছ চাষ সম্ভব নয় সেখানে সরকারীভাবে মাটি ভরাট করে কৃষি জমি বাড়াবে হবে এবং যেখানে মৎস্য চাষ করা যায় সেটা সেভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে;

(৭) মসজিদ মন্দির বা অন্য কোন উপসানলয় কে বহুতল বিশিষ্ট করে এ খাতে যথা সম্ভব জমি অধিগ্রহণ কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

(৮) গোরস্থান কে নতুনভাবে না বাড়িয়ে ঢাকা ও বড় বড় শহরের ন্যায় গোরস্থানের বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে কৃষি জমি রক্ষা সহজ হবে।

(৯) সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে জমি অধিগ্রহণ না করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বিদ্যমান অবকাঠামো কে বহুতল বিশিষ্ট করতে হবে।

(১০) সরকারী খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি কাজে লাগাতে হবে।

(১১) উঁচু নিচু জমিকে সরকারীভাবে সমতল করে কৃষি উপযোগী করার ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে করে জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

(১২) সকল ভবনের ছাদকে ভিয়েতনাম ও জাপানের মত করে বাধ্যতামূলক ভাবে কৃষি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে; বিশেষ করে উদ্যানতাত্বিক ফসল উৎপাদনের জন্যে।

(১৩) হাইড্রপোনিক হর্টিকালচার বা পানিতে কৃষি উৎপাদনের অত্যাধুনিক প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারণ করতে হবে।

(১৪) কৃষিপণ্যের জন্যে উন্নত বিশ্বের ন্যয় সরকারীভাবে অনলাইন বাজার তৈরি করতে হবে যেন কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যয্যমূল্য পেতে পারেন।

(১৫) কোন্ এলাকার কৃষক কোন্ বছরে কী ধরনের ফসল উৎপাদন করবেন সেটা সরকারীভাবে করতে হবে, যাকে বলা হচ্ছে ক্রপিং জোন ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন। সুষম ফসল না করলে প্রকৃত কৃষির সুফল লাভ কঠিন হবে। আমাদের কৃষকের বড় সমস্যা হলো এক বছর কোন কৃষি পণ্যের দাম বেশী হলে সকল কৃষক পরের বছরে ঐ কৃষিপণ্য চাষ করেন ফলে পরের বছরে তার উৎপাদিত নির্দিষ্ট পণ্যের দাম কম পান। এ ব্যাপারে কৃষি বিভাগকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

(১৬) আনুভূমিক কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে পাটের ন্যায় অনান্য ফসলের জেনম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করে প্রায়োগিক গবেষণার উপরে জোর দিতে হবে।

(১৭) কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহ বিদেশী আমদানীকারকদের চাহিদামাফিক পণ্য সরবরাহ করতে হবে, যেন কোনভাবেই নন কমপ্লায়েন্স ও ইন্টারসেফশনের মত কোন ঘটনা ঘটে কৃষি পণ্য রপ্তানী বাঁধাগ্রস্থ না হয়। আমরা দেখেছি ২০১৩ সালে রাশিয়াতে আলু সরবরাহ করার একটা সম্ভাবনময়ী দেশ ছিল, পরে কেন সেটা মুখ থুবড়ে পড়েছে, তার কারণ উদ্ঘাটনে করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক সময় শুধুমাত্র আমাদের ভুল ও অবহেলার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নে লেবু জাতীয় পণ্যের রপ্তানী বন্ধ ছিল। সে পথ সুগম করতে দু বছরেরও অধিক অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

(১৮) বাজার ব্যবস্থাকে যুগপযোগী ও আধুনিকায়ন করতে হবে। মধ্যসসত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমাতে হবে।

সত্যি বলতে আমাদের কৃষি কে নিয়ে আজ ভিন্নভাবে ভাবার সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে কৃষি কাজই খাদ্যের জোগান দিয়ে মানব ক্ষুধা নিবৃত্ত করে থাকে। বুভুক্ষ মানুষকে দিয়ে দেশজ উন্নতি সম্ভব নয়। তাই এখন সময় এসেছে আমাদের ভবিষ্যতের কৃষিকে নিয়ে বাস্তবসম্মত এবং যুগপযোগী কর্মকৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের। এ ব্যাপারে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকল কে একীভূত হয়ে কাজ করতে হবে এবং কাজ করার পথকে সহজ ও বাঁধাহীন করতে গবে।

এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে কাজ শুরু করার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে আমাদেরকেই । একজন কৃষিবিদ হিসেবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি বর্তমান সরকারের ঈর্ষণীয় সাফল্যের শীর্ষে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় আর সেই মন্ত্রণালয়ের চালিকা শক্তি রয়েছে অসম্ভব যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন চৌকষ এবং সৎ মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর হাতর, তাই তাঁর কাছ থেকে এ ব্যাপারে তাঁর কর্মকালীন সময়ে একটা কার্যকরী পদক্ষেপ আশা করছি।

খুব দৃঢ়তার সাথে যে কথাটি না বললেই নয়, তাহলো মানুষকে যদি খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে কৃষির উপরে বিশেষ গুরুত্ব না দেয়ার কোন বিকল্প নেই। পেটে খাবার না দিতে পারলে সরকাররের শক্তিশালী অনুসঙ্গগুলোও নিষ্ক্রিয় হতে শুরু করবে। অতএব কৃষির কোন বিকল্প নেই।মানুষের হাতে টাকা থাকলেই যে খাবার কেনা যাবে সেটার গ্যারান্টি দেয়ার কোন অবকাশ নেই, সে দৃষ্টান্ত আমরা ওয়ান ইলেভেনের ফসল সেনা সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে দেখেছি।  
মুক্ত বাজার অর্থনীতির এই ক্ষণে আমাদের কৃষিই পারে সগৌরবে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে সম্মানিত করতে। কৃষি উন্নতির জন্যে এমন সুন্দর আবহাওয়া ও জলবায়ুর দেশ পৃথিবীতে বিরল। তাই আমাদেরকে কৃষিকে এগিয়ে নেয়ার কোন বিকল্প নেই। অনেক অপ্রাপ্তির ব্যক্তিগত কষ্ট আমার মন মুকুরে থাকলেও, চাকুরি জীবনের এই পড়ন্ত বেলাতে এসে একজন কৃষিবিদ হিসেবে আমি গর্বিত। পরিশেষ লব্ধ কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সদাশয় সরকারের প্রতি সবিনয় নিবেদন,

“কৃষক কৃষিবিদ ও এদের সহযোগিদের সম্মিলিত প্রয়াশেই আজকের স্বয়ম্ভর বাংলাদেশ। তাই এদের চলার পথকে কন্টকাকীর্ণ নয় কুসুমাস্তীর্ণ করুন”। আর এটা করতে পারলেই দেশে এগিয়ে যাবে তরতর করে।   
আমরা সেই সুদিনের প্রতিক্ষায়!!

নিরন্তর শুভেচ্ছা সকলের জন্যে। আগামী ২০১৭ খ্রিষ্টীয় নতুন বছর সবার জীবনে আনন্দের বারতা বয়ে নিয়ে আসুক এই প্রত্যাশা করি। ধন ধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ফুলে ফলে ভরে উঠুক, ক্ষুধা মঙ্গা আর দারিদ্রতা জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকুক একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে এ আমার অষ্টপ্রহরের একান্তই আপনার ভাবনা।

তথ্য সূত্র:   
(০১) [www.ais.gov.bd](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ais.gov.bd%2F&h=ATNSNC41uy9F2dfhvdjJP7Oke5joBw1BQ8dHlWVtekGFMHi8jSqqLcPxWovY-yP4XrAyaR_OBxgoAtBKi4M8WGDbmWWHuyHCWvJvKXf23I-HYPRbaQcHnUpBjzAFxaU_sUFHX5Q8hG7ORmgWKA&enc=AZMSBjcMNRqZlgK_Ee1axzLTVaQ-9-Q6_zrxTUZnKdy7GSxMsJuO-yQqGVpW85JrBohTdXf9Q1-WBic7KdptmvIHRgA8-CYOotdsyYhEISGSu8v4RTdh7iUE1gznJhAOD2b3exGv4ZIgr376PrRFB4SA0CPojBzY9F56ii6iRx4MJeWRHYP6kCtO1dNmFWL4tyS5k_LSCkwjZ_2EpeU557t_&s=1)  
(০২) [www.dls.gov.bd](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dls.gov.bd%2F&h=ATOso3yT-hD7l9gXfWqEs5ZfRNUET_hZDBoWN_0ER5SbCb0VoxYphU9VHjUwNIMiLilVF5bjr7_wr0w9h915ngcieItGV4dRRK8CFcl4qxMepUz6lXwki7dotg7H914_cietSlJDGjB5ya955Q&enc=AZPdKYhF_ivWJrJeTjS4HHNsh7g3hrq1F4PSXViGqDY7EZubLOGrNVzesCR8drzHogXq7yBmfBoXoNt5Ia7-KZePzFO5CBBWT1H-zkN4WopiRDw64GD67gv9GvLZj-Vg66gcSC0INFPE9l6KyH2Hao7FgW8n-OhZgcyz98VmHSWbr3ykxex5mk7QuKxLc2iRQg5t2QRqhH2FQv2QBSk0l0DU&s=1)  
(০৩) [www.fisheries.gov.bd/](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fisheries.gov.bd%2F&h=ATO49gF6ZbVWKPPVC1s9Cb2yJZ-Gqu9MCKH5wGY1CQJYt9mtPNaDANDcUhlBXrNO_ka69nY3eO1VLyuyIVXGI26EESD71KhmNm4515WJ9TglZietZ8OQQvIrFo_aRv36h7c2cBpJAYo3SzMrpA&enc=AZMKgMWRsdef5OZeqZGJCSr9M7Tm9NJFNrUrSQ3W3_FtlKnVFqUj_LfLc1Bkeg0nQ5Cb21Q0uQtN_zPz7C7dqunTmeqQae3x7c6aStAVXkDUhnwh3gumYF9QbjnExyiWwR7a8exRMlumiMUzqIHgb7zwib4o7Nnb-KLKNTuqpK3-IaiKTxX-sN-1JSdiDu4Ou8NlKG0UzmxMRkSiJxcJb_dH&s=1)  
(০৪) [www.studypress.org](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.studypress.org%2F&h=ATPqqiCx5s1EIH2VJ-3m9kKVUDhB_24DMkvLfrUXhNyc1cecrkE3OcwOvvmlxc580_YRkWb2RC8imc98df5MAg0m0jW-AWg0-IgUUMxx2n0GhMVadji5E0khv_suFfTeYVEAY_K9-VJnXd3WWQ&enc=AZOugJJOGGwLWeFjnTZ_LZsVgplCH35DjBkAuwiAQk_B0PN77Hy4tk07RcxhAi1E-Xw6vk6D_O6HDvUJyrApuXYjvbofOwc2OLPsADrh_wqNQXj_9q76A42bAvet-7r2cBNnbxueC1Bmpd1-5uvZQy1TrkyLt1RpnsBvlyI31GfjrPhnH7x4xfFCpySlJFJdaHOT5_35AubZLoTasjj6zIck&s=1)  
(০৫) বাংলার কৃষি, ০৪.০১.২০১৫ খ্রি.  
(০৬) প্রথম আলো, ০৪.১১.২০১৩ খ্রি.  
(০৭) প্রথম আলো, ১৬.০৫.২০১৫ খ্রি.  
(০৮) যায় য়ায় দিন , ২২.০৫.২০১৬ খ্রি.  
(০৯) যায় য়ায় দিন , ১১.০৩.২০১৬ খ্রি.  
(১০) কালের কন্ঠ ২১.০৯.২০১৬ খ্রি.  
(১১) BanglaNews24:১০.০১.২০১৫ খ্রি.  
(১২) বিশেষ বুলেটিন, ২০১৫, বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি।  
(১৩) মাটির টান, বিশেষ প্রকাশনা, বিসিএস কৃষি এসোসিয়েশন, যশোর অঞ্চল, যশোর।